সাম্প্রতিক উপন্যাসে পরিবেশ বিপন্নতা

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

প্রায় দু দশক ধরে প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে। পরিবেশ আর দুষণ নিয়ে দুশ্চিন্তা সর্বত্র। পরিবেশের সংকট প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্যতার সংকট। বিপন্ন প্রকৃতি নয়, বিপন্ন আজ মানব সভ্যতা, মানুষের জীবন। সমগ্র জীব জগতের। এ সম্পর্কে এখনই সচেতন হওয়া দরকার। পরিবেশবিদদের মতো বাংলার সাহিত্যিকেরাও বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন। তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করছেন পরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা। পাঠককে এ সম্পর্কে সচেতনও করতে চাইছেন কখনও কখনও। সমসাময়িক পরিবেশ কেন্দ্রিক সমস্যাকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলছেন। গত দু দশকে লেখা বহু উপন্যাসে উঠে এসেছে পরিবেশের নানান সংকট, সমস্যা। এই ধরনের উপন্যাসকে পরিবেশ সচেতন উপন্যাস, পরিবেশ কেন্দ্রিক উপন্যাস, পরিবেশবাদী উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইংরেজিতে বলা হয়- 'environmental novel', 'ecological novel', eco-novel' ইত্যাদি। এই ধরনের উপন্যাসের সাহিত্য মূল্য ছাড়াও একটি পরিবেশ গত মূল্যও (ecological values) আছে।

দুই

বিভূতিভূষণ সেই কবে 'আরণ্যক' উপন্যাসে অনুভব করেছিলেন অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা। গাছপালার প্রয়োজনীয়তা। সবুজের প্রয়োজনীয়তা। তিনি জানতেন অরণ্য রক্ষা করতে পারবেন না। কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন এই অরণ্য ধ্বংসের কাজটাকে যতটা সম্ভব পিছিয়ে দিতে। বিভূতিভূষণের দোসর সত্যচরণ আক্ষেপ করেছিলেন তাঁর হাত দিয়ে অরণ্য ধ্বংস হয়েছিল বলে। উপন্যাসের কাহিনির শুরতেই তাঁর স্বীকারোক্তি- "এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হয়েছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনির অবতারণা।" উপন্যাসের শেষে নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া বইহার থেকে চলে যাওয়া সময় দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর থেকে নমস্কার করেছিলেন তিনি- "হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!..."

তিন

সমসাময়িক পরিবেশ-কেন্দ্রিক সাহিত্য পাঠে প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতি পাঠ' উপন্যাসটির কথা। প্রকৃতি এখানে পটভূমি নয়, তা বিষয় হয়ে উঠেছে। বিপন্ন প্রকৃতির

সবকটি স্তর লেখক তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে।

কলকাতার কাহিনির পটভূমি হিসেবে এসেছে। আরও স্পষ্ট করে বললে কলকাতার প্রকৃতি। কলকাতার পরিবেশের বিপন্নতার স্বরূপটি মূর্ত হয়েছে এখানে। আমাদের এই প্রিয় শহরটাকে আমরা দিনে দিনে কতটা নষ্ট করে ফেলেছি তাই লেখক স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

কলকাতার আকাশ থেকে পাখি কমে আসছে। পোকা কমছে। ব্যাঙ কমছে। এখন আর চোখে পড়ে না ব্যাঙ-শিকারিদের। কীটনাশক, ধোঁয়া, অ্যাসিড-বৃষ্টিতে দূষিত হচ্ছে কলকাতার প্রকৃতি। বহুতলে ঢেকে গেছে আকাশ। এরকম একটা অবস্থায় এই উপন্যাসের সতীপ্রসন্ন পরিবেশ চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সক্রিয় রাজনীতি না করে তিনি মানুষ আর পরিবেশকে সংস্কার মুক্ত করতে চান। প্রকৃতি সংরক্ষণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা দেখি তাঁর মধ্যে। সাধারণ জীবন যাপন করে তিনি বড় কষ্টে দশ বছর ধরে পরিবেশ চিন্তার একটি পত্রিকা বার করেন। 'পরিবেশ' নামের এই পত্রিকার লক্ষ্য সুস্থ পরিবেশ-বিষয়ক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই পত্রিকা এবং তাঁর সম্পাদকের সূত্রে উপন্যাসে কলকাতা সহ আমাদের দেশের পরিবেশের ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছেন কিন্নর।

জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে বহুতল বাড়ি। বে-আইনি কনস্ট্রাকশান ভেঙে পড়ে মৃত্যু হচ্ছে কত কত মানুষের। শালগাছ কেটে, স্বাভাবিক অরণ্য ধ্বংস করে মানুষ এখন তার সুবিধে মতো লাগাচ্ছে ইউক্যালিপ্টাস, যা বনভূমির জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে। কিন্নর স্পষ্ট করে বলেছেন ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি দ্রুত বেড়ে যাওয়া গাছ কখনোই দেশজ গাছের পরিপূরক হতে পারে না। শীত এলে ধোঁয়া মেশা কুয়াশার ভারী পর্দা ঝুলে থাকে কলকাতার আকাশে। হাজার হাজার উনুনের ধোঁয়া, মাইকের চিৎকারে হাওয়া পচে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ফুসফুসে চাপ পড়ে।

কলকাতার সবুজ ধ্বংস করে মানুষ ভাবে, রুফ গার্ডেন, ব্যালকনি গার্ডেন। গাছই তো বৃষ্টি ডেকে আনে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে ভূমির ক্ষয় রোধ করে। লেখক গাছের উপকারিতা সম্পর্কে বলছেন-

> একটি গাছ মানুষকে পঞ্চাশ বছরে যত অক্সিজেন দিয়ে যায়, এখনকার হিসেবে তার দাম পনেরো হাজার সাতশো টাকা। গাছ তো আরও
> কত কি দেয় মানুষকে- ছায়া, সবুজ, বৃষ্টি, কাব্য। এমনকি জীবনদায়ী ওষুধও। পঞ্চাশ বছরে একটি বৃক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি সম্পদ
> দেয় মানুষকে।

উপন্যাসে শুধু গাছ সংক্রান্ত তথ্য নয়, পরিবেশ দূষণের প্রতিটি স্তর প্রসঙ্গই তথ্যমূলক ভাবে এসেছে। যেমন এই উপন্যাস পড়ে আমরা জানতে পারি— যে কোনও আধুনিক শহরে মাথাপিছু খোলা জমি থাকার হিসেবে দুশো পঞ্চাশ বর্গফুট। লন্ডন সহ বিশ্বের বহু শহরে এই বিষয়টি মানা হয় কঠোরভাবে। আর কলকাতায় মাথাপিছু উন্মুক্ত জমির মাপ মাত্র কুড়ি বর্গফুট। সতীপ্রসন্ন পরিবেশের খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দূষণের সমস্যার কথা ভাবেন। তাঁর ভাবনায় দেখি— কলকারখানার বিষ ধোঁয়া প্রতি ঘন্টায় কলকাতার পঁয়ত্রিশ হাজার লিটার অক্সিজেনকে দূষিত করছে। তাছাড়া গাড়ির পোড়া পেট্রল ডিজেল আছে। ভারী বাতাস টানতে ফুসফুসকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর ক্রমাগত অভ্যন্তরে এই সব বাতাসি ক্লেদ জমতে জমতে

যক্ষ্মা, ক্যানসারের সম্ভাবনা জন্মে যায়। কলকাতা আর তার আশপাশের দু-হাজার কারখানার সাতাশ হাজার ফার্নেসের চিমনির মুখ দিয়ে তিনশো ছিয়ানব্বই টন বিষাক্ত ধোঁয়া মিশছে বাতাসে। তার সঙ্গে আছে ষাট হাজার রান্নার উনোনের ধোঁয়া। প্রতি বর্গমাইল বাতাসে প্রতিদিন দুশো একাত্তোর মেট্রিক টন দূষিত পদার্থ মিশছে। গোটা ব্যাপারটা ভাবলে গা ছমছম করে। যেন আইখম্যানের গ্যাস চেম্বারে সবাই একসঙ্গে বসবাস করছে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। সতীপ্রসন্নের এই ভাবনা চারিয়ে যায় পাঠকের মধ্যেও গা ছমছম করে আমাদেরও।

কলকাতার দৈনিক জঞ্জাল জমে দু-হাজার চারশো টন। মাথাপিছু সাতশো গ্রাম। তা সরানোর জন্য দৈনিক দুশো লরি দরকার। পুরসভার একশো পঞ্চাশটি লরির মধ্যে চালু আছে একশো তিরিশটি। দিনে সতেরো টনের বেশি ময়লা সরানো যায় না। জঞ্জালের দূষিত গ্যাস মেসে বাতাসে। প্রতিদিন হুগলি নদীর জলে মিশছে তিন হাজার টন দূষিত পদার্থ। মানুষ কোথায় যাবে।

এ সবের মধ্যেও সতীপ্রসন্ন ভাবেন পরিবেশটাকে বাঁচানো দরকার। রক্ষা করা দরকার ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স। যে কদিন পারা যায় জলে হাওয়ায় থাকার চেষ্টা করে যেতে হয়। উপন্যাসের শেষে দেখি সতীপ্রসন্ন একা নয়, তাঁর পাড়ার ছেলেরাও রাজনীতিকে সরিয়ে রেখে এগিয়ে এসেছে পুকুর বাঁচাতে। পুকুর ভরাট করে বহুতল করবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সকলে। "কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। সবুজে সবুজে ছেয়ে থাকবে চারপাশ। পরিষ্কার রাস্তা-ঘাট, গঙ্গায় পলিউশান নেই। পরিচ্ছন্ন আকাশ। কারখানার চিমনির ধোঁয়ায়, বাস-ট্যাক্সির পেট্রল-ডিজেল মবিলের পোড়া কলুষে, হর্নের শব্দে দম আটকে আসবে না। মাথা ছিঁড়ে যাবে না। বিয়ে বাড়িতে পুজোর প্যান্ডেলে মাইকের অত্যাচার বন্ধ- এসব ভাবতে ভালো লাগে।"

এরকম একটা ইতিবাচক জায়গায় এসে উপন্যাস শেষ হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন কিন্নর পরিবেশ বিষয়ক কোনও প্রবন্ধ গ্রন্থ লেখেন নি। তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। সেই মতো এগিয়েছে কাহিনি। উপন্যাসের সঠিক সংজ্ঞায় একে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না আমাদের। পরিবেশ এখানে কাহিনির গুরুত্ব পাওয়ায় সেই বিষয়গুলি আর অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় না পরিবেশ কেন্দ্রিক তথ্যগুলিও। এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই তথ্যের জায়গা। কিন্নর পরিবেশ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করেছেন গবেষকের মতো। ফলে উপন্যাসের পাঠক্রিয়ায় আমরা পরিবেশ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সমৃদ্ধও হতে পারি। তাতে এই সংক্রান্ত সচেতনতাও বাড়ে পাঠকের মধ্যে। আমাদের আলোচনায় এই উপন্যাসটির বিশিষ্টতা এখানেই।

চার

বিজ্ঞান প্রযুক্তির নিত্য নতুন আবিষ্কার আমাদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটিয়েছে। উন্নতি ঘটাচ্ছে সভ্যতার। এই অন্নয়ন-উন্নতি-প্রযুক্তির অগ্রগতির অনিবার্য প্রভাবে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে প্রকৃতি-পরিবেশ। অমর মিত্র এই বিপন্নতার একটি স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তাঁর 'কৃষ্ণগহ্বর' (১৯৯৮) উপন্যাসে। একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পত্তনকে কেন্দ্র করে তিনি পরিবেশের বিপন্নতার বিভিন্ন স্তরগুলিকে আলোকিত করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদ্যুতের।

বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা গড়তে অপরিহার্য এই বিদ্যুৎ। তাই বিদুৎ প্রকল্পেরও অনিবার্যতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একটি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প যেমন সভ্যতার অন্ধকারকে আলোকিত করে তেমনি ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত করে প্রকল্প সন্নিহিত এলাকার পরিবেশ-প্রকৃতি-সমগ্র জীবজগৎ।

এই উপন্যাসে হুগলী নদী সন্নিহিত কাঁঠালবেড়ে গ্রামে তৈরি হবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-থার্মাল পাওয়ার। বহুজাতিক আলো কোম্পানি কিনে নিয়েছে এই কাঁঠালবেড়ের আটশো বিঘে জমি। অজানা-অচেনা অজ গাঁ কাঁঠালবেড়ে এখন খবরের শীর্ষে। আলো কোম্পানীর বিশাল আয়োজন। আর এই আয়োজন কত কত মানুষকে খেয়ে ফেলেছে। গিলে ফেলেছে কত কত মানুষের বসত ভিটে, চাষের জমি। আলো কোম্পানীর কাজ চলছে জোর কদমে। লরি লরি ছাই আসছে। আটশো বিঘে জমি ভরাট করা হচ্ছে ছাই ফেলে। ছাই ফেলে উঁচু করা হচ্ছে জমি। ডেভেলপ করা হচ্ছে অ্যাশ ফেলে। লেভেলিং হচ্ছে। আড়াই ফুট থেকে তিন ফুট, কোথাও চারফুট পর্যন্ত অ্যাশ ফেলা হচ্ছে। এই আটশো বিঘেতে যত গাছ ছিল কাটা হয়ে গেছে। গাছের যত পাখি, যত বাসা, যত ছায়া, যত বাতাস সব উধাও হয়ে গেছে।

কোম্পানি নতুন ঘর করে দিয়েছে কাঁটালবেড়ের আটশো বিঘের মানুষদের জন্যে। কিন্তু যার চার ছেলে আলাদা সংসার করেছিল তারা আলাদা ঘর পায় না। একটা ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। মানুষের পেশার রূপান্তর ঘটে। বুড়ো মধু ধীবরের মতো কেউ কেউ মানতে পারে না। উঠতে চায় না পূর্বপুরুষের বসত ভিটে ছেড়ে। তার আর্জি জানায় চিঠিতে বড় কাছারিতে। মুখ্যমন্ত্রীকে। লেখাপড়া জানা ছোট বউমাকে সে লিখতে বলে-

কাঁঠালবেড়ে শো'পোকা, পরজাপতি, মাঠোর গোখরো, কেউটে, চন্দরবোড়া, ইঁদুর, ব্যাঙ, মেটুলি সাপ নেই, সব ছাইচাপা পড়েচে, এদিকি যে ঢ্যামনা সাপডা ছিল, তারেও দেখিনে। ভাদ্দর মাসে জমি দখল নিল, তখন তারা ঘুমুতি গেল গত্তে। তারপর ছাই পড়ল নষ্ট ধানের উপর, ঘুমুতে ঘুমুতে মরে গেল সব, এসবও লেখ বউমা। মহাপুরুষের বট, আশুত, পাকুড় নিম, শিরিস, আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, সব গাছ কাটা পড়ল। বাদুড়, পেঁচা উড়ে গেছে গাঙ দে, লেখ, শীত নাই কাঁঠালবেড়েতে, সব লিখে দাও।

মধু ধীবর জানে তারা না লিখলে কেউ লিখবে না। এবার ফড়িং দেখেনি। এ ছাইয়ে কেউ বাঁচে না। লিখতে লিখতে তার বউমা টের পাচ্ছিল- 'তাকে ঘিরে আছে শুধু হেলে বংশী, মধু ধীবর নয়, এই অন্ধকারে জোয়ান পুরুষ সাপটি, তরুণ গোখরোটি, মেটুলি সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড়, বাদুড়, টিয়া ফড়িং, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, কাক, কোকিল সব যেন এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁঠালবেড়েতে তারা শতজন্ম বাস করছে, শতজন্মের বাস ওঠাতে হচ্ছে।"

এখানে মানুষ-পশু-পাখি-সমগ্র প্রাণী জগত একাকার হয়ে গেছে। তারা সকলে যে বিপন্ন আজ। মধু ধীবর সবার প্রতিনিধিত্ব করছে। এই বিপন্নতা অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করছে ইকোলজি-ইকোসিস্টেমকে। গাছপালা বা প্রাণীরা নয়, থার্মালের করাল গ্রাসের শিকার হয়ে যায় নদীও। প্ল্যান্টের ময়লা যাবে গঙ্গায়।

পরিবেশের প্রশ্ন যে ওঠে না তা নয়। বিপন্ন পরিবেশ সংস্থার সদস্যরা আসে। রাখাল তুং, দিবাকর খাঁড়ারা বিরোধিতা করে। আলো কোম্পানীকে রুখতে অনেক আন্দোলন হয়। অনেক কমিটি তৈরি হয়। মেধা পাটকরের মতো পরিবেশবিদও আসেন কাঁঠালবেড়ে গ্রামে। কিন্তু বন্ধ করা যায় নি থার্মাল। থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট সমস্ত পৃথিবীতে একটা থ্রেট। ফ্লাই অ্যাশ সব শেষ করে দেবে। পরিবেশ ধ্বংস করে দেবে। দিবাকর কোলাঘাটের উদাহরণ টেনে এমন এল এ-কে বোঝাতে যায়- গ্রামের পর গ্রাম কিভাবে চাপা পড়ে গেছে সেখানে। নদী নষ্ট হয়ে গেছে। পান চাষ নষ্ট হয়ে গেছে। গাছের পাতা পর্যন্ত কালো হয়ে গেছে। রূপনারায়ণে মাছ নেই। বাগানে ফল নেই। পুকুরের জল কালো। ছেলে বুড়ো সবাই কাশছে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি সে। দিবাকর কাঁঠালবেড়ে ছেড়ে চলে গেছে। রাখাল তুং সুযোগ বুঝে দু পয়সা পকেটে ভরতে চায় এখন।

ছ-টি ইউনিট চালু হলে বছরে প্রায় চল্লিশ কোটি টন ছাই উৎপন্ন হবে। সেই ছাই ফেলার জন্য দরকার ছাই পুকুর। আটশো বিঘে ছাড়াও পরে আরও দুশো একর জমি নেবে। কিন্তু এইটুকু ছাইপুকুরে কত ছাই ধরবে! ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে। ছাই পুকুর এখন কাটা হচ্ছে না। এই পুকুর কেটে মাটি নেওয়া যেত। ছাইয়ের ওপর মাটির লেয়ার পড়বে। প্রচুর মাটি দরকার। আটশো বিঘের বাইরের চাষের জমি থেকে মাটি নিচ্ছে কোম্পানি। দেড়া দামের লোভে চাষিরা মাটি বিক্রি করছে। নতুন এক রকমের আয়ের মুখ দেখছে মানুষ। বদলে যাচ্ছে জীবিকা। চাষাবাদের জায়গায় মাটি বিক্রি। জমি চাষের উপযোগী থাকছে না আর। এসবই আসলে ছাইয়ে ভরে যাবে।

এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মালারানি। সে প্রথম থেকে আলো কোম্পানির পক্ষে সওয়াল করে এসেছে। স্বামী রতনের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক জুড়েছে। কাঁঠালবেড়ের সব আঁধার ধুয়ে দেবে আলো। তার পেটেও দানা বেঁধেছিল আলো। কিন্তু সেই আলো একদিন মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। সেই মালারানিও এখন আর আলো চায় না। চায় না ছাই পুকুর। “জল নেই ছাই। ছাই উড়ছে। সেই পুকুরে চানে যাও, ছাই মেখে উঠে আস। পায়ের সোনাবর্ণ তখন ছাই হয়ে যাবে। চাঁপাবর্ণ কিছুই থাকবে না। রাক্ষসী! রাক্ষসী! তার রূপ তখন রাক্ষসীর রূপ!”

সে পাগল হয়ে যায়। তাকে রতন সমুদ্রে নিয়ে যায় হাওয়া বদলে। দিঘা যাওয়ার পথে কোলাঘাট থার্মাল প্রজেক্টের চেহারা দেখেছে। রাতে হোটেল থেকে বিচে এসে বসে। অন্ধকারে সেই সমুদ্রের মধ্যেও ছাই দেখে মালারানি। রতনের মনে হয় ছাইয়ের সমুদ্রের সামনে বসে আছে তারা।

> ঘন কৃষ্ণ গহ্বর। তার চোখের সামনে কোলাঘাটের বিপুল ছাই-স্তূপ, ছাই-ঢাকা আকাশ জেগে ওঠে। রতন বউ-এর মুখের দিকে তাকায়। ডেকে তুলবে। কই মালারানিকেও তো দেখা যায় না। কৃষ্ণগহ্বরে মালারানিও মিলিয়ে গেছে ... উত্তরের মাঠে এল আলো কোম্পানি, চিমনি আকাশে উঠতে লাগল, এর পুলিশ, এল ছাই-এর গাড়ি- এই তো হয়ে গেল সব। ছাই উড়তে লাগল। ছাই-এ ভরে গেল। ছাইয়ে মিলিয়ে গেল মালারানি। সব এখনই যেন হলো। ... সব ধূসর হয়ে গেল রতনের মাথার ভিতরে। তার চোখে জল এল। এই লবণাক্ত জলটুকুই রয়েছে শুধু, বাকি সব কৃষ্ণগহ্বরে।

এই গহ্বরের মধ্যেই ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি আমরা। আলো কোম্পানির অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরা এখানে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে বায়ুতে কার্সিনোজেন-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত। কুপবন বহিতেছে সর্বত্র। তৃতীয় বিশ্বে এর পরিমাণ বেশি। চাই বা না চাই প্রতিনিয়ত আমরা ডুবে আছি সেই কুবলয়ে। বাধ্য হচ্ছি এক হাঁ মুখ কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করতে। বায়ু দূষণের বহু কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণকে অমর মিত্র তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে তার ভয়ঙ্কর স্বরূপটাকে উন্মোচিত করেছেন এখানে।

পাঁচ

পরিবেশের আর একটি সমস্যা নদীর ভাঙন। আমাদের এই রাজ্যের বহু এলাকা এই ভাঙনের শিকার হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু এলাকা। বদলে গেছে নদীর প্রবাহ। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বহু বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে গঙ্গা। তিলোত্তমার মজুমদারের 'রাজপাট' (২০০৮) উপন্যাসে এই গঙ্গানদীর ভাঙনের কথা উঠে এসেছে কাহিনির সূত্রে। উপন্যাসের পটভূমি মুর্শিদাবাদ জেলা। মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গা বহু মানুষের রুটি রুজির সংস্থান যেমন করে দেয়, তেমনি বহু মানুষকে মুহূর্তে পথের ভিখিরি করে দিতেও দ্বিধা করে না। গঙ্গার ভাঙনে প্রতি বছর কত কত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পুণ্যতোয়া গঙ্গা মুহূর্তে রাক্ষুসি হয়ে ওঠে। তখন আর কিছুই করার থাকে না মানুষের। কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক একটি গ্রাম স্মৃতি হয়ে যায়। - "তখন শান্ত নদীটি বয়ে যাচ্ছে পটে আঁকা ছবিটির মতো। কে বলবে, ওই নদীর তলায়, খানিক আগেও একটা আস্ত গ্রাম ছিল। গৃহস্থ ছিল কত। কথ শোকগাথা। মানুষের কত প্রাচীন ইতিহাস ধরা ছিল সেই গ্রামে। কে বলবে? চতুষ্কোণা আজ হতে বিপন্ন স্মৃতিকথা।" চতুষ্কোণা গ্রামের কথা বলা হয়েছে এখানে। এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটি মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেছে গঙ্গার ভাঙনে। তার সকল গ্রামীণ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস নিয়ে।

তিলোত্তমা এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন- নদী যেমন বহু ইতিহাসকে মুছে ফেলে, তেমনি তাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন ইতিহাস তৈরি হয়। আসলে নদী বয়ে চলে ইতিহাস নিয়ে। যে সকল অঞ্চলের ওপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই সব অঞ্চলের মিথ-কিংবদন্তী-লোককথা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি-ঐতিহ্য... জনজীবনের প্রতিটি স্মৃতি-অনুস্মৃতি বয়ে নিয়ে চলে সে। আমাদের সভ্যতার ইতিহাস এক অর্থে নদীর প্রবহমানতার ইতিহাস। 'রাজপাট'-এ সেই ইতিহাস তুলে ধরেছেন তিলোত্তমা। নদীর স্বাভাবিক প্রবহমানতাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের কথা মনে পড়ে যায়।

মানুষ তার প্রয়োজনে নদীকে ব্যবহার করেছে বারবার। আর দরকার হলে বেড়ি পরাতেও দ্বিধা করেনি। সেই শিকল ভেঙে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসতে চায় সে। মুক্ত নদীর এই মুক্তিকাঙ্ক্ষা শেষ করে দেয় বসতির পর বসতি। নদী বাঁধ নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি চলে। এই পাথর ফেলা বা বাঁধ দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকে চায় নিজেদের আখের গোছাতে। মুনাফা লুঠতে। তাই কাজের কাজ কিছু হয় না। সরকার থেকে টাকা আসে। আর সেই টাকা আক্ষরিক অর্থেই

জলে চলে যায়। বছরের পর বছর নদী সংলগ্ন মানুষজন ভাঙনের ভয় সঙ্গে নিয়ে দিন গুজরান করে। গঙ্গা মুর্শিদাবাদকে দুভাগে ভাগ করেছে- রাঢ় আর বাগড়ি। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস এই দুটি অঞ্চলের সমন্বয়ে পূর্ণতা পায়।

চারপাশে যে প্রাকৃতিক তাণ্ডব চলে, বা প্রকৃতি সৌন্দর্যময়ী যে রূপটি মুগ্ধ করে আমাদের তারও পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে এই উপন্যাসে। পতিতপাবনী গঙ্গার পৌরাণিক মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে এসেছে। গঙ্গার উৎস থেকে সমুদ্রে বিলীন হওয়ার টোপোগ্রাফিক বর্ণনা করা হয়েছে। পাহাড়-পর্বত-মালভূমি-সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলার সময় তার গতিপ্রকৃতির যে রূপান্তর তার ভৌগোলিক ব্যাখ্যাও আছে। একই সঙ্গে প্রবহমান গঙ্গার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা। কোনো ব্যাখ্যার সঙ্গে কোনো ব্যাখ্যার বিরোধ নেই। আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন লেখক। এভাবেই আমাদের গঙ্গা সংক্রান্ত পৌরাণিক মিথ কিংবদন্তীর একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নদীবিজ্ঞানের নিরিখে স্রোতের প্রবাহের আলোচনা করা হয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনিতে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা প্রধান হয়ে ওঠেনি ঠিকই; কিন্তু পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা- নদীর ভাঙনের সমস্যা উপন্যাসের কাহিনিকে প্রভাবিত করেছে। বাংলার কত কত মানুষের জীবনচর্চা নদী নিয়ন্ত্রণ করে তা বোঝা যায় এই উপন্যাসটি পড়লে। আমাদের এই পরিবেশ বিষয়ক আলেচনায় তিলোত্তমা মজুমদারের 'রাজপাট' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিতা এখানেই।

ছয়

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' (১৯৯৮) উপন্যাসে কেন্দ্রে আছে জলদূষণ। পানীয়জলের ভয়াবহতা। আমাদের রাজ্যের আর্সেনিক সমস্যা। আর্সেনিক সংক্রান্ত দূষণ মহামারির আকার নিয়েছে বিগত কয়েক দশকে। আর এই ভয়াবহতার মূলেও মানুষ।

গবেষণায় জানা গেছে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি কাদা-পলি দিয়ে গঠিত আর্সেনিক পুষ্ট ভূ স্তর আছে ভূতল থেকে ৭০ থেকে ২০০ ফুট গভীরে। এই স্তরটি হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চল ধরে বাংলাদেশের ওপাশেও ছড়ানো। এই স্তরটি চিরকাল ধরেই ছিল। কিন্তু আগে তো আর্সেনিক সমস্যা ছিল না। গত তিন দশক দরে গ্রীষ্মকালে সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলের বিপুল পরিমাণ ব্যবহার ঐ স্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত যখন বৃষ্টি হয় না তখন এলোপাথাড়ি ডিপ এবং স্যালো নলকূপ দিয়ে জল টেনে তোলার ফলে জলের স্তর অত্যন্ত নীচে নেমে যায়। পাইরাইট নামে এক ধরনের মিনারেল, আর্সেনিক মিলেমিশে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে যার মধ্যে, জলস্তরের শূন্যস্থানে বায়ুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিষে পরিণত হয়। তা ছড়িয়ে গিয়ে আক্রান্ত করে সমস্ত স্তর। জলের লেবেল বেশি বেশি উঁচু থাকলে শূন্যস্থান তৈরি হয় না। বায়ুর সঙ্গে পাইরাইটের রাসায়নির বিক্রিয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাই বর্ষাকালে আর্সেনিক সমস্যা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তো আর জমির পরিমাণ বাড়েনি। ফলে পরিমিত জমিতে ফসল বাড়াতে হয়েছে। উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের ফলে চাষের জন্য জলের প্রয়োজন বেড়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ জলের লেভেল নেমে যাওয়ায় শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পাইরাইটের মধ্যে আর্সেনিক রূপের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের ক্রিয়া বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে মারণ বিষ। নতুন বীজ, নতুন চাষে সেচের জলের দাবি বাড়বে, উৎপাদন তিন চার গুণ হবে এবং আর্সেনিকের উৎপাত বাড়বে অনিবার্য ভাবে। এ যেন সভ্যতার অগ্রগতির সাইড এফেক্ট।

নিম্নবঙ্গে পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে উত্তরে মালদহ পর্যন্ত বিস্তৃত পাইরাইট স্তর- ঠিক কালীয়র মতো, কালীদহের চলেযার ছোবল লুকিয়ে থাকত।

এই আর্সেনিক দূষণের বিষয়টি অবতারণার পুর্বে লেখক মিথ পুরাণের প্রসঙ্গ এনে দেখাতে চেয়েছেন এই সমস্যার প্রাচীনত্ব। কালীদহের কালীয় সাপের পৌরাণিক কাহিনি এনে অতীত বর্তমানকে, মিথ আর বাস্তবকে চমৎকার মুনশিয়ানায় গেঁথেছেন একই সূত্রে। পুরাণের বিনির্মান করেছেন সাধন। কৃষ্ণের পায়ের মহাভার কালীয়র বিষাক্ত ফণা ভেঙে মটকে থেঁৎলে পড়েছিল। এরই অনুষঙ্গে লেখকের মন্তব্য-

> এমনিভাবে এক-একটি ফণা ভেঙে মটকে থেঁৎলে পড়েছিল যত, জলের রং পাল্টাতে থাকে। এগুলো যেন কালীয়র ফণা নয়, জলের ব্যাকটেরিয়া, আর্সেনিক, সিসা বা লোহার গ্রেডিয়েন্টের এক একটি শক্ত অস্তিত্ব। চুন, ফটকিরি, ক্লোরিন থেকে শুরু করে এক একটি পরিষেধক ছড়ানো হচ্ছে, জল হয়ে উঠছে টলটলে।...আজ এই তো দহ, যমুনা এবং গোঠের শস্যক্ষেত্র। দিনরাত ভুটভুট স্যালোর আওয়াজ, হাই ইলডিং চাষ। পাঁচহাজার বছরের নিষাদ, দুসাদরা নেই বটে, আছে রবিদাস পাড়া, সর্দারপাড়া। কালীয় কি আজও শুয়ে আছে? অতিক্রান্ত কালে নতুন শাপগ্রস্থ দেহ নিয়ে? ঐ জলে? পাঁচহাজার বছর পরেও?

যমুনা তীরবর্তী মালঞ্চ, গাজন, পাঁচপোতার রবিদাসপাড়া সর্দারপাড়ার মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত। পায়ে কালো দাগ। সামর্থ্য থাকলে জমি বেচে অন্যত্র চলে যায় মানুষ। এইসব গ্রামে মেয়ে দিতে চায় না কেউ। জলের বিষের জন্য আত্মায় কুটুম্বরা আসে না। নলকূপের মুখে আর্সেনিক নিরোধক 'কিট' লাগানোর সামর্থ্য থাকে না মানুষের। ফিল্টারও কিনতে পারে না। এইসব মানুষের পুষ্টির বড় অভাব। আর পুষ্টিকর খাবারের অভাবে আর্সেনিকের সমস্যা বাড়ে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকাগুলিতে আর্সেনিকের প্রভাব বেশি। আসলে এই অসুস্থতার সঙ্গে পুষ্টির সম্পর্কও জড়িয়ে। সাধন দারিদ্র্যের সঙ্গে আর্সেনিক সম্পর্কের বিষয়টিকে যথার্থভাবে ইঙ্গিত করেছেন। আমাদের এই বাংলার প্রেক্ষাপটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এটি।

যথেষ্ট গভীর নলকূপের অভাব। সরকার থেকে যদিও বা বরাদ্দ করা হয় চল্লিশ পাইপের কল, রাজনীতির চাপান উতোরে তাও আটকে যায়। চল্লিশ পাইপ অর্থাৎ ৮০০ ফুট পাইপের কল। এতে আর্সেনিক সমস্যা অনেকটা কমে যায়। কারণ এত গভীরের জলে আর্সেনিক থাকার সম্ভবনা অনেকটাই কম। গ্রামের রন্ধ্রের রন্ধ্রে এখন রাজনীতির বিষ। সাধন প্রাসঙ্গিক ভাবে রাজনীতির বিষাক্ত পরিবেশটাকেও চিহ্নিত করেছেন। যমুনা থেকে জল ফিল্টার করে গ্রামে পাঠানোর পরিকল্পনা হয় সরকারি লেভেলে। কিন্তু নানান কারণে সে কাজও এগোয় না। বিষাক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিষাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ একাকার হয়ে গেছে। গ্রামীণ

মানুষেরা সামগ্রিকভাবে যে একটা বিষাক্ত আবহে বেঁচে আছে তা ধরতে চেয়েছেন লেখক।

এরই মধ্যে অন্নপূর্ণার মতো কেউ কেউ ছেলেদের স্কুলে পাঠানোর সময় জলের বোতল সঙ্গে করে পাঠায়। শেষ পর্যন্ত সাধন একটা আশার কথা বলেন। অল্প কিছু মানুষের মধ্যে হলেও আর্সেনিক সংক্রান্ত সচেতনতা এসেছে। নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে আর্সেনিকের শিকার হতে চায় না কেউ কেউ। তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করে এই সমস্যা প্রতিকারের, প্রতিরোধের। পরবর্তী প্রজন্মকেও সচেতন করতে চায়। তার সূত্রপাত স্কুলে জলের বোতল সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ায়। অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ জল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে দিয়ে দেওয়ায়। উপন্যাসের অন্নপূর্ণার গুরুত্ব অপরিসীম। লেখক তাঁর নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেছেন এই চরিত্রটির মাধ্যমে। এর হাত ধরেই লেখক পাঠকদের সচেতন করতে চেয়েছেন আর্সেনিক সম্পর্কে। তার করাল গ্রাস থেকে বাঁচানোর একটা দিশা দেখিয়েছেন।

আসলে শুধু আর্সেনিক সংক্রান্ত সমস্যা নয়, তার থেকেও বড় কথা এই সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার অভাব। সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে তা প্রতিরোধ করা কিছুটা হলেও সম্ভব। দারিদ্র্য অপুষ্টির মধ্যেও সবার আগে দরকার সমস্যা সম্পর্কে আপামর মানুষের সচেতনতা। আমাদের এই বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরি মানুষকে সচেতন করা। সাধন এই বোধ থেকেই অন্নপূর্ণ চরিত্রটির অবতারণা করেছেন।

আধুনিক মনস্ক মেয়েটির মৃত্যু সংক্রান্ত বিচারকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে কাহিনি। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই আখ্যানের বয়ানও স্বতন্ত্র। আদালতে অন্নপূর্ণার মৃত্যু সংক্রান্ত শুনানিই যেন বিচারপতির সঙ্গে আমরাও ভাবছি। কাহিনি শুরুই হয়েছে এভাবে- "ধর্মাবতার, মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে মেয়েটি কোনও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ...।" শুধু এই শুরুতেই নয়, বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের শুরুতেও এসেছে সেই 'ধর্মাবতার' সম্বোধন। আসলে লেখক এই আঙ্গিকের মাধ্যমে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। সেই প্রশ্নের কেন্দ্রে যেমন আছে পরিবেশের বিপন্নতা, তেমনি আছে রাজনীতির বিপন্নতা। সামাজিক বিপন্নতা। সমগ্র সভ্যতার বিপন্নতার দিকেই লেখকের অমোঘ ইঙ্গিত। এই আখ্যান এভাবে শুধু পরিবেশ সংক্রান্ত ঘেরাটোপে আটকে না থেকে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে।

সাত

বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ সব অরণ্য। যে কয়টি এখনও অবশিষ্ট আছে সেখানেও চোরা কাঠ-কারবারিদের দাপট। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে যাচ্ছে বন-জঙ্গল। আর তার দুর্বিষহ প্রভাব পড়ছে পরিবেশে। বদল ঘটছে আবহাওয়া জলবায়ুর। বদলে যাচ্ছে ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও। এ রকম অবস্থায় বড় প্রাসঙ্গিক মনে হয় ভগীরথ মিশ্রের 'মধুবনের বন্ধুরা' (২০০২) উপন্যাসটির কথা। ফ্যান্টাসির আদলে এই উপন্যাসে চোরাকাঠ পাচারকারিদের হাত থেকে জঙ্গল রক্ষা করবার কাহিনি শুনিয়েছেন ভগীরথ। মূলত ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাসটিতে লেখকের পরিবেশ ভাবনার গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুটা রূপকথার আদলে বড়দের জন্যও অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলেন। আমাদের সচেতন করেন পরিবেশ সম্পর্কে। সচেতন করেন বৃক্ষ তথা জঙ্গলের উপোগিতা সম্পর্কেও।

এই উপন্যাসের পবন একজন কাঠুরে। মধুবনে ঢুকে পছন্দসই গাছ কাটে। তারপর রাক্ষসের মতো লরি এসে রাত্রিবেলা সেই কাঠ নিয়ে যায়। এভাবে বনের অর্ধেকের বেশি গাছ ফাঁকা হয়ে গেছে। পবন দাসের ভয়ে সমস্ত জঙ্গল সন্ত্রস্ত। শুধু গাছ নয়, পশু পাখিরাও। কাটা গাছ পাশের গাছের ডালপালা নিয়ে পড়ে। বাসা বা কোটরের ভেতর থেকে ঠিকরে পড়ে পাখির বাচ্চারা। কেউ বুক ফেটে মরে যায়। ডিমগুলো পড়ামাত্রই ভেঙে যায়। যে গাছ কাটে পবন সে গাছের ফল খায়। তার তলায় বসে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়। আহত গাছটা তখনও ডালপালা দুলিয়ে হাওয়া করতে থাকে পবনকে। মানুষের প্রতি এতটাই সহনশীল এবং দরদী এই গাছ। যে তাকে হত্যা করছে তাকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুশ্রূষা করে চলেছে।

গাছেরা সকলে অপেক্ষায় থাকে কবে কার পালা আসবে। কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে কোনও কোনও গাছ। সে কান্না পৌঁছয় না পবনের কানে। পবনের কুড়ুলের ঘাগুলি যেন সারারাত ঠক ঠক করে বাজতে থাকে ওদের বুকে। নিহত গাছটির জন্য পাতায় পাতায় অশ্রু জমে। শেষরাতে টুপটাপ করে ঝরে পড়ে তাদের চোখের জল মাটির উপরে। পাতলা হয়ে আসে জঙ্গল।

ছোট ছোট প্রাণীগুলো সংখ্যায় কমে আসছে দ্রুত। বাঘ হাতি ভালুকের দল চলে যাচ্ছে অন্যত্র। হাওয়া এসে খবর দেয় শহরের। সেখানে নাকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গাছেদের অজস্র কঙ্কাল। বিশাল বিশাল গুদামে স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখা আছে তাদের হাড়গোড়। ভয়ে কেঁপে ওঠে তারা। মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলে ঠিক করে রাজার কাছে যাবে। পাশাপাশি জঙ্গলের সকলেও আসবে। হাওয়ারা সে খবর ছড়িয়ে দেয় সমস্ত এলাকায়।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে সকলে হাজির হয় বৃক্ষরাজের কাছে। তিনি বলেন- "ওরা যা পারে, আমাদের তা শোভা পায় না। আমরা হলাম গাছ। সৃষ্টির আদি পুরুষ। আমরা কোনও হীন পন্থা গ্রহণ করতে পারি না। আমরা প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতিকে ভালোবাসি। প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলবই। ... হত্যার বদলে হত্যা, খুন কা বদলা খুন, মানুষের মতো আমরাও এ সব নীতি অনুসরণ করলে আমাদের নিন্দে হবে, অধঃপতন হবে।" সকলে একযোগে পবনকে রুখবে। সকল প্রস্তুত হয় রাজার পরামর্শে। রাজার এই সিদ্ধান্তে আমরা আর একবার সচেতন হলাম গাছের মহত্ব সম্পর্কে। হয়তো বা উল্টো করেও বলা যায়- আর একবার বুঝতে পারলাম আমরা- মানুষেরা কতটা হীন, ক্ষুদ্র।

পরদিন পবন আসে কুড্ডুল নিয়ে। একটা মোটা অর্জুন গাছ চিহ্নিত করে কাটবে বলে। সূর্যের তেজটা আজ বেশি মনে হয় পবনের। গাছগুলোর পাতা নড়ে না। হাওয়া স্থির। গরমে কষ্ট হয় খুব। গাছের ছায়ার দিকে সরে গেলে গাছও সরিয়ে নেয় তার ছায়া। পবন যতবারই ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায় গাছটা ততবারই ওর শরীর থেকে সরিয়ে নেয় ছায়া। গনগনে রোদ্দুর। হাওয়াও বন্ধ। তার গায়ের চামড়া ঝলতে যেতে লাগল। সারা জঙ্গলময় দৌড়ে বেড়াল সে। কিন্তু মধুবনের কোনও গাছই আজ ছায়া দিল না তাকে। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। সে দৌড়ে গেল নদীর দিকে। নদী তাকে দেখতে পেয়ে মিলিয়ে গেল বালির মধ্যে। চারিদিতে তপ্ত বালি। পবন ভয় পেয়ে গেল। পাহাড়ের কাছে তার কুঁড়ে। দৌড়ে গেল সে সেখানে। জিভ ঝুলে গেছে। হাঁফাচ্ছে। বাসায় ঢুকে জলের কুঁজো উপুড় করল। একফোঁটাও জল পড়ল না। জ্ঞান হারিয়ে গেল তার।

জ্ঞান ফেরার পর শুরু হয়ে যন্ত্রণা। সে পাগলের মতো ছুটে এল মধুবনে। বনের সব গাছই ছায়া সরিয়ে নিল সে দাঁড়ানো মাত্র। দৌড়ে গেল বৃক্ষরাজের কাছে। রাজা বলল- "তুই খুনি। আমার অনেক প্রজাকে তুই খুন করেছিস। তোর জন্য মধুবনের অনেক পশু, কত সুন্দর সুন্দর পাখি মরে গেছে খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে। অনেকেই আমার রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের জন্য। তোর জন্যই মেঘ-বন্ধুরা আমার রাজ্যে নামতে পারে না।"

গাছেদের রাজার পরামর্শে পবন যত গাছ কেটেছিল প্রতিটি কাটা গুঁড়ির পাশে দুটো করে সেই প্রজাতির গাছ লাগিয়ে দেয়। সেই চারা যাতে না মরে যায় তার পরিচর্যা করে। নদী থেকে জল এনে দেয়। তার গায়ের জ্বালা জুড়োয়। নদীতে নেমে জল খায়। প্রচণ্ড খিদেতে গাছ ফল দেয় তাকে। পিটপিট নামের একটা বানরের সঙ্গে আলাপ হয়। সেই বানরটা পবনকে সারা জঙ্গল ঘুরিয়ে আলাপ করিয়ে দেয় সব গাছাপালা পশু-পাখিদের সঙ্গে। রাতে সেই পিটপিটের সঙ্গে শুয়ে পড়ে ছাতিমের ডালে।

পবন ধীরে ধীরে জঙ্গলের গাছপাতার ঔষুধী গুণ সম্পর্কেও জেনেছে কিছু। ভেষজ পাতাগুলোয় অনেক অসুখই সেরে যায় ম্যাজিকের মতো। একদিন পবন নদীর ধারে দেখতে পায় একটি মেয়ে তার অসুস্থ সন্তানকে কোলে নিয়ে কাঁদছে। গরিব মানুষ ডাক্তারের কাছে যেতে পারে নি। পবন জঙ্গল থেকে কিছু শেকড় বাগড় এনে দেয়। তাতেই সেরে যায় ছেলেটি। তার নাম ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। অনেকেই আসে ওষুধ নিতে। তারা নাঙ্গাবাবা বলে পবনকে। পবন তাদের জানায় গাছের উপকারিতা। হাওয়া-ঝড় মেঘ-বৃষ্টির কথা বুঝিয়ে বলে। জঙ্গল নিকেশ হয়ে যাওয়ার জন্য বৃষ্টি কমে যাচ্ছে। মাটি-হাওয়া তপ্ত হচ্ছে। নদী-পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। সবের মূলেই এই গাছ। কিন্তু এই জঙ্গল যে বেশিদিন থাকবে না, তাও বলে সে।

কয়েকদিন পর শহুরে কাঠওয়ালার লোক ভরত। প্রচুর লোক, করাত, কুড়িটা লরি, অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। জঙ্গলের পাশে এসে থামল ট্রাক। বিশাল বাহিনি প্রস্তুত হল। জঙ্গলের দিকে এগোতে গিয়ে থেমে গেল সবাই। বহু মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। টর্চের আলোয় তারা দেখল জঙ্গলের গা ঘেঁষে শয়ে শয়ে মানুষ। চারপাশের গাঁ থেকে এসেছে তারা। তাদের হাতে লাঠি-বর্শা। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলছে দপ দপ করে। জঙ্গলটাকে বর্মের মতো ঘিরে ধরেছে মানুষ। সবার সামনে চকচকে কুড়ুল উঁচিয়ে পবন। সহসা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠল- "জয় মধুবনের জয়, জয় কপিল নদীর জয়, জয় নাঙ্গাবাবার জয়।" রাতের অন্ধকারে সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল দুর-দূরান্তে। প্রচণ্ড শব্দে ডেকে উঠল জঙ্গলের পশু-পাখির দল। সাপেরা ফণা তুলে দাঁড়াল। জোনাকিরা যে যার শরীরে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে ভরিয়ে ফেলল প্রতিটি গাছের ডাল। সারা জঙ্গল আলোয় ভরে গেল। সেই আলোয় ভরতেরা দেখল প্রতিটি গাছ উন্মত্তের মতো জ্বলছে। তাদের উপর যেন হুড়মুড়িয়ে পড়বে। কাতারে কাতারে ছুটে আসছে জঙ্গলের প্রাণী। আকাশ আঁধার করে পঙ্গপালের মতো উড়ছে মৌমাছি ভিমরুলের ঝাঁক। সকলের সম্মিলিত গানের উদাত্ত সুর ঝড়িয়ে পড়ল মধুবন, কপিল নদী এবং তার চারপাশের বাতাসে।

নিজেরাই পারে নিজেদের বাঁচাতে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে। এই মেসেজটাই

দিয়েছেন লেখক। ছোটবেলা থেকে কিশোরদের গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করেছেন তাঁর এই কিশোর পাঠ্য উপন্যাসের মাধ্যমে।

মনে পড়ে রাজস্থানের বন-শহীদদের কথা। যোধপুর এলাকার মাড়ওয়াড় প্রদেশের খেজ রালি গ্রামে খেজরি গাছের জঙ্গল ছাওয়া অঞ্চলে বিশনোই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাস করত। তখনকার মহারাজা অভয় সিংহ প্রাসাদ নির্মাণ করতে চাইলেন। চুনা পাথর গলানোর জ্বালানির জন্য রাজ কাঠুরেরা এসেছিল খেজরির জঙ্গলে। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর। সেদিন বিশনোই গ্রামের মানুষেরা নিজেদের সন্তানসম বৃক্ষদের জড়িয়ে ধরেছিল কাঠুরেদের হাত থেকে রক্ষা করতে। ৩৬৩ জন মানুষ সেদিন প্রাণ দিয়েছিল শুধু গাছ রক্ষা করার জন্য। জঙ্গল বাঁচানোর জন্য। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে সেদিন বৃক্ষকে রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন তাঁরা। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে। আমাদের আর কবে হুঁশ হবে। উল্লেখ্য- ২০১০ থেকে ঐ দিনটি 'জাতীয় বন-শহীদ দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।[১]

আট

পরিবেশ দূষণের মারাত্মক চেহারা উঠে আসছে বিভিন্ন সমীক্ষায়। ভূপাল এখনও মানুষের বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। ১৯৮৪-র ডিসেম্বরের দুর্ঘটনার প্রভাবে আজও বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মাচ্ছে। একবার যার শরীরে বিষ ঢুকেছে সে সারা জীবনের মতো অসুস্থ হয়ে গেছে। 'গ্যাস ভিক্টিম' তকমা লেগে গেছে তাদের গায়ে। এই রকম মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। কারণ তারা হয়তো সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। পারলেও সন্তানের বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দাম্পত্য জীবন স্বস্তিতে নেই। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিগুলোতে ৪০%-র বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। আবার নিজেদের সমস্যার কথাই অনেকে জানেন না। তাঁদের হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি ফেইলিওরের সংখ্যা বাড়ে। প্রশাসন নির্বিকার। প্রশাসনের বক্তব্য- "অত বড় বিপর্যয়ের ধাক্কা তো থাকবেই"। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ভিক্টিম শুধু। তারা এই বিপর্যয়ের দায় নেবে কেন? যাদের অবহেলায় এরকম ভয়ানক কাণ্ড ঘটল তাদের কী হল? ইউয়িন কার্বাইডের বর্জ্য সরানোর ব্যবস্থা হয়নি এখনও। তাই সেখানকার অভিশাপও মুছছে না।[২]

সাঁতরাগাছির ঝিলে দূষণের জন্য শীতে পাখিরা আসছে না আর। শকুন বিলুপ্তির পথে। জলবায়ু পরিবর্তন মারাত্মক রূপ নিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এপ্রিলের তাপমাত্রা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি। বিশ্বজুড়ে সমুদ্রতল বৃদ্ধি বছরে গড়ে ৩.২ মিলিমিটার মতো হলেও আমাদের সুন্দরবনে তা প্রায় ৮ মিলিমিটার। কারণ মাটি বসে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সুন্দবনে তো আরও বেশি। ইতিমধ্যে লোহাচরা বা ঘোড়ামারার মতো দ্বীপ পুরো বা অনেকটাই ডুবে গেছে।[৩] শুধু সুন্দরবন নয়, পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপগুলিই এখন বিপন্ন। যাদের সামর্থ আছে তারা বসবাস গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাবার ব্যবস্থা করছেন। বহু দ্বীপে কোনও পাহাড় বা উঁচু জায়গা নেই। বন্যা বা অন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে দ্বীপবাসীদের পালানোর উপায় নেই, সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া।[৪]

পরিবেশের বহুমাত্রিক স্বর ধারণ করে আছে এই সময়ের বাংলা উপন্যাসে। পরিবেশবিদদের

পাশাপাশি লেখকরাও পরিবেশ নিয়ে ভাবছেন এখন। লেখকদের এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটছে তাঁদের লেখায়। তাঁদের এই পরিবেশ ভাবনা সঞ্চারিত হচ্ছে বৃহত্তর পাঠকদের মধ্যেও এভাবেই তো জন চেতনার সঞ্চার হয়। মানুষ রুখে দাঁড়ায় পরিবেশের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখতে চায়। আর সমবেত চাওয়াই তো সাফল্য এনে দিতে পারে। পেরেছেও তো।

ওড়িশার কালাহান্ডি আর রায়পাড়া জেলার ডোঙ্গরিযা কোন্ড জনজাতির মানুষ তাদের নিয়মরাজা নিয়মগিরি পর্বতকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলেছে ২০০৪ সাল থেকে। এই বছরই ওড়িশা সরকারের সঙ্গে বহুজাতিক সংস্থার চুক্তি হয়েছিল কালাহান্ডির লাঞ্জিগড়ে অ্যালুমিনিয়ম কারখানা করার। তার জন্য প্রচুর বক্সাইট দরকার। এই নিয়মগিরি পাহাড়ে বক্সাইট পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি তারা। আদিবাসী মানুষরা পাহাড় রক্ষা করতে পেরেছে। কতদিন পারবে কে জানে। কতদিন সরকার ও বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে কে জানে। না পারলেও চেষ্টা তো করছেই।[৫]

মনে পড়ে চিপকো আন্দোলনের কথা। বন শহীদদের কথা। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কথা। এরকম আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যায়। এই ঘটনাগুলি সেভাবে আলোচিত হয় না হয়তো। কিন্তু এবার এই ধরনের ঘটনাগুলিকে আলোকিত করার সময় এসেছে। নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। সেই ভাবনায় কিছুটা হলেও অক্সিজেন দেবে এই পরিবেশবাদী উপন্যাসগুলিও। সাহিত্যের পরিবেশ-মূল্যকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে।

প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের মানুষ প্রকৃতি সচেতন ছিল। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বরং মানুষের পরিবেশ সচেতনতা কমেছে। বনবাসী আর্যরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। বেদ-উপনিষদ-আরণ্যক-রামায়ণ-মহাভারতের দীর্ঘ অংশ জুড়ে আছে অরণ্য-প্রকৃতির কথা। কৌটিল্যের সময়ে বনভূমি সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অশোকের শিলালিপিতে পথের দুধারে বৃক্ষরোপণের নির্দেশ আছে। শেরশাহ নির্মিত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন সম্রাট। মোগলরা উদ্যান তৈরিতে আগ্রহী ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১ রাহুল রায়, 'অমৃতাদেবীর স্মরণে', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৮ আগস্ট ২০১০

২ সোমা মুখোপাধ্যায়, 'শরীরে বিষ, ফতিমাদের তাই বর জোটে না', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৫ ডিসেম্বর ২০১৩

৩ এই তথ্য দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুগত হাজরা। অধ্যাপক হাজরার বক্তব্য তুলেধরেছেন জয়ন্ত বসু তাঁর 'সুন্দবন না বাঁচলে কলাকাতও মরবে' ('আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ জুন২০১৪) লেখায়।

৪ জয়ন্ত বসু, ঐ

৫ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, 'শুধু ওঁদের শেখাব ? নিজেরা শিখব না ?, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৮ আগস্ট, ২০১৩